হাবিব, বন্ধু আমার

মুহম্মদ জুবায়ের

বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রকর ও অঙ্কনশিল্পী কাজী হাসান হাবিব ১৯৮৮ সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে প্রয়াত হন। ২৫ ডিসেম্বর হাবিবের যুগপৎ জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর স্মরণে এই রচনাটি লেখা হয়েছিলো ২০০৩-এ।

আপনার আঁকা একটি ছবির নাম দিয়েছিলেন 'উইদিন, উইদাউট'। আপনার প্রথম একক প্রদর্শনীর প্রস্তুতির সময় ছবিটির একটি উপযুক্ত বাংলা নামের জন্যে দু'জনে অনেক সময় ব্যয় করেছিলাম মনে আছে। তখন একমাত্র বিবেচনা ছিলো নামটিতে যেন ইংরেজির মতো কাব্যিক দ্যোতনা অক্ষুণ্ণ থাকে। এখন 'উইদিন, উইদাউট'-এর সঠিক মানে জানি – উইদাউট অবস্থার মধ্যে পতিত না হলে উইদিন-কে ভালো জানা হয় না। আপনি চলে যাওয়ার পর পনেরো বছর ধরে জানছি। শেষ সময়ে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কথাও না। বিদায় দেওয়া-নেওয়া হয়নি। ভাবি, কী করে পারলেন! আমি পরবাসী হওয়ার পর মাত্র একবার ফোনে কথা হয়েছিলো। ফোন তুলে বললেন, এরকম তো কথা ছিলো না! সেই বাক্যটিই এখন আপনাকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। ফোনে কী আর আপনাকে পাওয়া যাবে? তাহলে, কাকে আর বলি!

আপনাকে নিয়ে লেখা আমার জন্যে সহজ নয়, আপনি বুঝবেন। আপনি কি বুঝেছিলেন, আপনার শেষ দিনগুলোতে আমি ঢাকায় উপস্থিত ছিলাম না? কেউ সেই সময়ে আপনাকে জানিয়েছিলো, আমি ঢাকায়। সিরাজকে, সারোয়ারকে বলেছিলেন যাচাই করতে। আপনার চলে যাওয়া তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, অথচ আমি ঢাকায় উপস্থিত থেকেও আপনার কাছে যাইনি – জানি না কার মাথায় এই নিষ্ঠুর রসিকতা করার বুদ্ধি এসেছিলো। আমি যে তখন সত্যিই ঢাকায় নেই, আপনি বিশ্বাস করেছিলেন কি না, কোনোদিন জানা হবে না। আপনার শেষ দিনগুলোর আবাস মহানগর ক্লিনিকে ফোন করে হীরু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমাদের হীরু ভাই, ডাক্তার, কোনো ভরসা দেননি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি জানালেন, সে অবস্থাও আর নেই!

প্রায় অনন্তকালের দূরত্বে বসে তখন নিজেকে কীরকম অসহায়, নিষ্ফল এবং করুণ মনে হয়েছিলো, কোনোদিন লিখতে পারিনি। আপনার শরীরে ক্যানসার পাওয়া গেলো অক্টোবরে, ৮৮-র বন্যায় সারাদেশ তখন ডুবে আছে। আপনাকে বম্বেতে পাঠানো হয়েছিলো, ফিরে এলেন। এতো কিছু ঘটে গেলো দু'মাস সময় ধরে, তার কিছুই আমার জানা হয়নি। ডিসেম্বরের আঠারোতে ঢাকায় ছোটো বোনের কাছে ফোন করে জানলাম। ফোন করি মহানগরে। আঠারোর পরে তেইশে আবার ফোন করে জেনেছি কোনো উন্নতি নেই, সময় ফুরিয়ে আসছে। হীরু ভাইকে বলেছি, এখান থেকে আমার কিছু করার থাকলে জানান।

অর্থহীন কথা, খুবই বোকা বোকা। যা নির্ধারিত হয়ে আছে, আমি তা বদলানোর কে! ফোন রেখে দিলে এক ধরনের আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসে। আমার স্ত্রীকে বলি, হাবিব এই পঁচিশ তারিখেই যাবে,

আমি জানি। ডিসেম্বরের পঁচিশে ওর জন্মদিন। ওকে যদি কিছুমাত্র চিনে থাকি, আমি জানি ওই দিনটিই সে ঠিক করে রেখেছে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্যে!

মৃত্যুশীতল সেই ডিসেম্বরের চব্বিশ গেলো, পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ গেলো। ঢাকায় কাউকে ফোন করার সাহস হয় না। আমি তো জেনে গেছি, কী শুনবো! শুনতে চাইনি। অথবা চেয়েছি যতোটা দেরিতে জানা যায়। নিজের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত ও পরাস্ত হয়ে আবার ঢাকায় ফোন করি ৮৯-এর জানুয়ারির প্রথম দিনে। ধারণাটিকে যাচাই করে নেওয়া, আর কিছু নয়। আপনি গেলেন সেই পঁচিশেই, আপনার জন্মদিনে।

এখন এই ডিসেম্বরে আপনার বয়স হতে পারতো পঞ্চান্ন। অথচ আপনি আটকে থাকলেন চল্লিশেই। রাসুল গামজাতভ নামের সোভিয়েত কবির একটি কবিতা সম্ভবত আপনিই পড়িয়েছিলেন। কবি স্মরণ করছেন, বাল্যকালে তিনি তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সমান কিছুতেই হতে পারছেন না বলে দুঃখিত ও হতাশ। ভাই যুদ্ধে গিয়ে আর ফেরে না, কোনোদিন ফিরবে না। বিষণ্ন কবি এখন সেই ভাইয়ের চেয়েও বয়সে বড়ো, অথচ এই বোধ তাঁকে কোনো পরিতৃপ্তি দেয় না! হাবিব, আপনি বয়সে বড়ো ছিলেন। তখন। এখন আর নয়। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়ো হয়ে উঠবো, কোনোদিন ভেবেছি! পঞ্চাশের এপারে-ওপারে থাকা আমাদের মনে হতেই পারে, এই বিষণ্ন বয়স আপনাকে চিনতে হলো না। আপনার তারুণ্যের ছবিটিই চিরকালের হয়ে থাক বরং।

পনেরো বছরে আপনাকে নিয়ে পনেরোটা অক্ষরও লেখা হয়নি আমার। ছেঁড়া টুকরো টুকরো কোনো কথা, কোনো ঘটনা মনে এলে সামলাতে শিখে নিয়েছি এতোদিনে। কিন্তু লিখতে বসলে যে আস্ত ছবিটা এসে সামনে হাজির হবে, তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমি কোথায় পাবো?

২.

সেই সময় আমরা কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলাম। বিশ শতক ফুরিয়ে যেতে তখনো বাইশ-তেইশ বছর বাকি। আমরা বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যসেন হলের ২১৭ নম্বরে নিয়মিত সান্ধ্য আড্ডায় হাজিরা দিতে আসা কয়েকজন। জহুরুল হক হলের ৩৬৪ থেকে আসে ফিরোজ সারোয়ার। নারিন্দার ২৪/১ বেগমগঞ্জ লেন থেকে সিরাজুল ইসলাম। গেণ্ডারিয়ার ৪ রজনী চৌধুরী রোডের ইমদাদুল হক মিলন। সূর্যসেনে ২১৭-র বাসিন্দা আমি। অনিয়মিত আসে বুলবুল চৌধুরী, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সুকান্ত তখন পাশ করা ডাক্তার, বিবাহিত এবং গৃহী। তবু তার সংসারবুদ্ধি খুব আঁটোসাঁটো ছিলো বলে মনে হয় না। আর পাশ দিলেই চাকরি করতে হবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই বলে সিরাজ তড়িৎ প্রকৌশলের বিদ্যা নিয়ে ঠিকাদারী করে। মিলনও তখন ফুলটাইম ঠিকাদার, জগন্নাথ কলেজে পার্টটাইম ছাত্র। বুলবুল একটি পত্রিকায় কাজ করে। ফুলটাইম ছাত্রের ঝাণ্ডাওয়ালা শুধু সারোয়ার আর আমি – আসলে কাজীর গরু, খাতায় থাকলেও গোয়ালে নেই। সেই দুরন্ত অস্থির সময়ে বাংলাদেশ চলেছে এক বিষম অনিশ্চিত ঘোরের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ড, ক্যু, সামরিক শাসনের জগদ্দল, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের মহোৎসব। ত্বরিত অর্থোপার্জন ও ভাগ্যগঠনের সুযোগ নাগালের খুব দূরে নয়। সেদিকে মনোযোগ আমাদের ছিলো না। সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিজেরাই ছত্রখান হয়ে আছে, আমাদের সামান্য সামর্থ্য এসবের বিপরীতে দাঁড়ায় কী করে! যৌবন পরাজয় স্বীকার করতে জানে না, পাশ কাটাতে চায় বড়োজোর। আমরা পলায়ন করতে চেয়েছি, শিল্প-সাহিত্যের স্বেচ্ছাচারিতার ভেতরে আশ্রয় খুঁজেছি।

এই কাণ্ডজ্ঞানহীনদের দলে হাবিবের শামিল হওয়ার আপাত কোনো কারণ ছিলে না। তার ছিলো স্ত্রী-পুত্রসহ সংসার, একটি স্থির রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কিছু অপ্রত্যক্ষ (সেই সময়ে) তৎপরতা, তথ্য দফতরে সরকারি চাকরির পাশাপাশি দৈনিক সংবাদ ও সাপ্তাহিক রোববারে খণ্ডকালীন কাজ। বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকায় কাইয়ুম চৌধুরী-পরবর্তীকালে হাবিব ছিলো সফলতম, সে ব্যস্ততাও কম নয়। এতোকিছুর পরেও ছবি আঁকার সময় তার আলাদা করা ছিলো। কলাবাগানের টিনের চালওয়ালা দুই কামরার বাসায় শয়নকক্ষের সঙ্গে লাগোয়া উত্তরের বারান্দায় খাবার টেবিল। অন্যটি বসার ঘর এবং সেখানেই হাবিবের কাজের জায়গা। চারদিকে বইপত্র, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ছবি, রং-তুলি, সাদা ক্যানভাস। সংসারের সকল কর্মের শেষে আঁকতে বসতো সে গভীর রাতে। দু'তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমানোর সুযোগ ছিলো না। উজ্জ্বল রোদ তার রাতজাগা চোখ সহ্য করতে পারতো না, ভুরু কুঁচকে আলো সামাল দিতো সে।

এই হাবিব কী করে যে ২১৭-র (এই নামটিই আমাদের মধ্যে চালু ছিলো) আড্ডায় নিয়মিত আসতো জানি না। তবে রাত ন'টার পরে ওকে ধরে রাখা যেতো না, তখন তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। আন্দোলন জারি রাখা বলে রাজনীতিতে একটা কথা চালু ছিলো তখন। হাবিব চলে গেলে আমরা বাকি চারজন আড্ডা জারি রাখতাম। সারোয়ার ততোদিনে বলতে গেলে ২১৭-র দ্বিতীয় স্থায়ী বাসিন্দা, কোনো কোনো রাতে সিরাজ-মিলনেরও পুরনো ঢাকায় আর ফিরতে ইচ্ছে করতো না।

একদিন এই আড্ডায় সিরাজ 'হরিণের দুধ' নামে একটি কিশোর উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা শোনায়। কথা বলতে বলতে হাবিব বলপয়েন্টে নিউজপ্রিন্টের ওপরে বইয়ের প্রচ্ছদের একটি স্কেচ করে ফেলে। সে উপন্যাস সিরাজের লেখা হয়নি। স্কেচটি থেকে যায় আমার কাছে। বহু বছর।

আরেক সন্ধ্যায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়সে আমরা কে কোথায় কী করবো, এই প্রসঙ্গ জরুরি হয়ে ওঠে। হাবিব আমাদের প্রত্যেকের প্রৌঢ় বয়সের একটি করে স্কেচ করেছিলো। আমারটিতে দেখা যাচ্ছে, আলোয়ান গায়ে দেওয়া একটি ভগ্ন মুখে সুদৃশ্য গোঁফ, বিস্তৃত কপালে বিস্তর বলিরেখা। নিচে লেখা, ভবিষ্যতের মু.জু.। অন্যরা তাদের ভবিষ্যতের ছবি রেখেছিলো কি না জানি না, আমারটি ছিলো। হাবিবের অন্তর্ধানের (মৃত্যু শব্দটি খুব কঠিন, আর হাবিবের বেলায় তা আমার বিশ্বাসের বাইরে। এখনো। চোখে দেখিনি যে!) পরে ঢাকায় গিয়ে স্কেচ দুটি জ্যোৎস্না ভাবীর কাছে গচ্ছিত রেখে আসি। নিউজপ্রিন্টের তৈরি লেখার একটি খাতা ছিলো হাবিবের (কোনো পত্রিকার ডামি হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছিলো, অনুমান করি)। তার লেখা একটি অসমাপ্ত গল্প ছিলো সেই খাতায়। বলেছিলো, গল্পটা আর আমার লেখা হবে না। খাতাটা আপনার কাছেই থাক, আপনি লিখে ভরাবেন। এই খাতাটিও জ্যোৎস্না ভাবীর সংগ্রহে দিয়ে এসেছি। এগুলো তাঁর কাছে অমূল্য!

৩.

বসন্তকালের এক সন্ধ্যায় হাবিবের সঙ্গে শাহবাগ হয়ে রমনার দিকে হাঁটছি। সিদ্ধেশ্বরী বা মালিবাগ কোথাও যাওয়ার কথা। শর্টকাট করার জন্যে টেনিস কমপ্লেক্স-এর পাশ দিয়ে রমনা পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়ি, পুরনো গণভবনের দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবো। পার্কের আলো-অন্ধকারের ভেতরে দু'জনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে টের পাই, আমরা চক্কর খেয়ে যাচ্ছি একই জায়গায়। গণভবনের গেট শুধু নয়, কোনো গেটই চোখে পড়ছে না, ক্রমাগত হেঁটে চলেছি। শেষ পর্যন্ত পার্কের বাইরে এসে কিছুক্ষণ বুঝতে পারিনি আমরা ঠিক কোথায়। রাস্তা, আশেপাশের বাড়িঘর সব অচেনা লাগে। দু'জনেই

বিভ্রান্ত – কিছুই চিনতে পারি না! কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। পরে দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বুঝে ফেলি, আমরা গণভবনের উল্টোদিকের গেটে দাঁড়ানো!

এই রহস্যের কিনারা করা যায়নি। ভুলে-ধরা বলে একটা কথা শোনা ছিলো। আমাদের তাই হয়েছিলো? একই সঙ্গে? মানা যায়নি, এসব সংস্কারে আমাদের বিশ্বাস নেই।

আরেক দিনের ঘটনা। ১৯৮০ সালের। একটি লাল হোন্ডা ১১০-এ সওয়ার হয়ে তখন ঢাকা শহর দাপিয়ে বেড়াই। হাবিবকে নিয়ে ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে গোল্ডেন গেট-এ ঢুকেছি সন্ধ্যার খানিক পরে। ঘণ্টাদুয়েক পরে বেরিয়ে দেখি, তুমুল বৃষ্টি। ভেতরে বসে টের পাওয়া যায়নি। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। ওই তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে আমরা দু'জনে মোটর সাইকেলে চেপে বসি। রাস্তায় নেমে টের পাই, কাজটা ঠিক হয়নি। বৃষ্টিতে সামনে পাঁচ হাত দূরের জিনিসও ভালো করে দেখা যায় না। কী উপায়ে জানি না, আমরা যার যার ঘরে অক্ষত ফিরেছিলাম সে রাতে।

এখন পেছনে তাকিয়ে ঘটনা দুটিকে আশ্চর্য প্রতীকী বলে মনে হয়। আমরা তখন সত্যিই খানিকটা দিকভ্রান্ত, উদভ্রান্ত ছিলাম। বাইরের যাবতীয় প্রতিকূলতা ও বিপদসংকুলতার ভেতরে ছিলো আমাদের অনিশ্চিত যাত্রা।

৪.

১৯৭৫-এ একটি গল্প ডাকে পাঠিয়েছিলাম দৈনিক সংবাদ-এর রবিবাসরীয় পাতায় (তখনো রোববার ছুটির দিন)। বছর দুয়েক আগে মফস্বল শহর থেকে ঢাকায় এসেছি পড়তে। সম্পাদকের সামনে যাওয়ার সাহস তখনো হয়ে ওঠেনি। এক বা দুই সপ্তাহের মাথায় লেখাটি ছাপা হয়ে যায়। ঢাকার কোনো কাগজে আমার প্রথম গল্প। সচিত্রীকরণের কাজ দেখে মুগ্ধ আমি। জানা যায়, আঁকার কাজটি কাজী হাসান হাবিবের। নামে চিনি, বইয়ের প্রচ্ছদের কাজ করে হাবিব তখনই যথেষ্ট খ্যাতিমান। এক শনিবার বিকেলে হাসান হাফিজ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় বংশালের সংবাদ অফিসে। হাবিবের সঙ্গে পরিচয় হয়। সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাতের সঙ্গেও।

হাসনাত ভাইয়ের উদার প্রশ্রয়ে অবিলম্বে প্রতি শনিবার বিকেলে সংবাদ অফিসে আমাদের আড্ডা শুরু হয়। পাশের দোকান থেকে চা-ডালপুরি আসে। অধূমপায়ী হাসনাত ভাই সেই ছোটো ঘরটিতে পাঁচজন বিষম ধূমপায়ীকে কেমন করে সহ্য করতেন, জানি না। কাজী হাসান হাবিব সেখানে একমাত্র কাজের কাজী। আমরা উল্টোদিকে বসে তার কাজ দেখি, আড্ডা ছাড়া আমাদের সেখানে আর কোনো ভূমিকা নেই। হাবিবের তুলিতে ছবি, একেকটি অবয়ব ফুটে উঠতে দেখি। হয়তো আমাদেরই কারো লেখার ইলাস্ট্রেশন হচ্ছে। গল্পের ভেতর থেকে তুলে আনা কোনো দৃশ্য। আঁকিয়ের নিজস্ব ব্যাখ্যায় সে দৃশ্য নতুন অর্থ পেয়ে যাচ্ছে। তখনই প্রথম বুঝি, লেখক এবং চিত্রকরের দেখার চোখ আলাদা। সিরাজ একদিন বলেছিলো হাবিবকে, আমরা লেখালেখি যা করার চেষ্টা করি, তার সবটা আপনি বোঝেন। আমরা আপনার ছবি বুঝি না কেন? এই ব্যবধানটা ঘুচিয়ে ফেলা দরকার না?

হাবিব বলেছিলো, অবশ্যই। চেষ্টা করলেই সম্ভব।

সিরাজ-মিলন-সারোয়ারের কথা জানি না, আমি ছবি বুঝতে খুবই ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমার অক্ষমতা।

শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমকে মেলানোর চেষ্টা ছিলো হাবিবের। প্রিন্ট গ্রাফিকস নিয়ে কাজ করার আগ্রহ ছিলো, কিছু কিছু করেওছিলো। তার দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী ছিলো ছবি এবং কবিতাকে মেলানোর চেষ্টা।

হাবিবের জীবদ্দশায় কম্পিউটার যন্ত্রটি বাংলাদেশে জনপ্রিয় বা সহজলভ্য হয়নি। এই মাধ্যমটিকে পেলে হাবিব বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পকে আরো অনেক দিতে পারতো, সন্দেহ নেই।

৫.

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরে মতিঝিল কলোনীর এক বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে বাস করেছিলাম মাস ছয়েক। হাবিবের পরোক্ষ যোগাযোগে তা সম্ভব হয়েছিলো। পরের ঠিকানা বেইলি রোডে। নতুন তৈরি বেইলি ডাম্প কলোনির একটি বাসা বরাদ্দ হয়েছিলো হাবিবের দুলাভাই তাজুল ভাইয়ের নামে। কলোনির সেই ছোট্টো দুই কামরার বাসা তাঁর জন্যে অনুপযুক্ত, সে বাসায় তিনি উঠবেন-কি-উঠবেন না করছেন। হাবিবের সুপারিশে সেই বাসায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। কয়েকমাস পরে তাজুল ভাই ওই বাসায় উঠে আসার সিদ্ধান্ত নিলে আমার পরবর্তী বাসস্থান হয় কলাবাগানে – হাবিবের বাসার দুশো গজের মধ্যে। হাবিব ২৯ উত্তর ধানমণ্ডি, আমি ৫০/ক। সাল ১৯৮০।

তখন মধ্যরাতের পরে ঢাকায় কারফিউ জারি ছিলো, জনগণনন্দিত সরকারের 'নিরাপত্তা হই' উপহার! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক, যে তখনো সংসারী নয়, নিরাপত্তা তার কী কাজে লাগবে! তার চাই ইচ্ছেমতো চলাফেরার অধিকার। মধ্যরাতের পর বাইরে থাকা খুব জরুরি, এমন নয়। কিন্তু ইচ্ছে হলেও বেরোনো যাবে না, এই বোধের মধ্যেই তো শ্বাস বন্ধ করে ফেলার অবস্থা!

রাত বারোটায় কারফিউয়ের আগে কলাবাগান এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়ি। নিজের ঘরে ফেরার আগে হাবিবের ঘরে আড্ডা। কলাবাগানের ছোটো গলিতে কারফিউ না মানলেও চলে। হাবিব তখন ক্যানভাসের সামনে বসছে। কথা বলতে বলতে রং মেশাচ্ছে, সেই রং ক্যানভাসে উঠে আসছে। ফুটে উঠছে বিষণ্ন নারীমূর্তি, একটি খোলা জানালা, ছুটন্ত শিশু, উদার নীল আকাশের এক কোণে খুব চেনা একটি চাঁদ। চাঁদ বিষয়ে হাবিবের বিশেষ দুর্বলতা ছিলো। স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্না বলেই কি? ঠাট্টাও হতো এই নিয়ে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, গোঁফের তলায় মিটিমিটি হাসতো সে।

আঁকতে বসে গান শোনার অভ্যাস হাবিবের। সব ধরনের গানেরই কান ছিলো তার। ইংরেজি গানের ভেতরে সে-ই আমাকে নিয়ে যায়। বাংলা গানে অভ্যস্ত কানে ইংরেজি গানকে অর্থহীন চিৎকার মনে হতে পারে, আমারও হতো। অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে সে আমাকে একে একে শুনতে দেয় কারপেনটারস, ক্লিফ রিচার্ডস, বীটলস। ভ্যান গখকে নিয়ে ডন ম্যাকলীনের 'ভিনসেন্ট' (স্টারি স্টারি নাইট), পিংক ফ্লয়েডের 'ডার্কসাইড অব দ্য মুন', সায়মন অ্যান্ড গারফাংকেল-এর 'ব্রীজ ওভার ট্রাবলড ওয়াটার' বা 'সাউন্ড অব সাইলেন্স' প্রথম শুনেছিলাম হাবিবের ছবি আঁকার ঘরে। বীটলস-এর 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়মন্ডস' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলো, একেবারে বিশুদ্ধ পরাবাস্তব, কয়েক লাইনের একটিমাত্র গানের ভেতরে যে কতো ছবি! এইসব ছবি হাবিব দেখতে পেতো, আমি পেতাম না। আমি শুনতাম। এই পনেরো বছর পরেও ভুল হয়ে যায় আমার, কোনো একটি গান ভালো লাগলে মনে হয়, হাবিবকে যদি শোনাতে পারতাম!

১৯৮২-র এক সকালে হাবিব মলিন মুখে আমার বাসায় আসে। বিকেলে আর্ট কলেজে তার প্রথম একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন। একটি বিষয়ে তার উদ্বেগের কথা আমার জানা ছিলো। প্রদর্শনীর পুস্তিকা

ছাপার দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, সেই ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগের রাত পর্যন্ত পুস্তিকা দূরে থাক, কাজটি আদৌ হয়েছে বা হচ্ছে কি না তা-ও জানা যায়নি।

আমার বিছানায় বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলে সে। ব্যাপারটি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। হাবিবকে এমন বিপন্ন দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। প্রজ্ঞা ও স্থিরতার জন্যে আমরা বরাবর তার শরণাপন্ন হই। সেই হাবিবকে এম বিপন্ন দেখে এখন আমি কী বলি! আমার ধারণা হয়, পুস্তিকা সম্ভবত আদৌ তৈরি হয়নি। একজন আঁকিয়ের জীবনের প্রথম একক প্রদর্শনীর আবেগ-উত্তেজনা অনুমান করা যায়। কোনো কথা বলার সাহস হয় না। কিন্তু ঘটনা আমার অনুমানকে পরাস্ত করে। হাবিব খামের ভেতর থেকে একটি পুস্তিকা বের করে দেয়। তার প্রদর্শনীর। শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়ে এলেও গণ্ডগোল সেখানেই। ছবির রং সব ওলটপালট হয়ে গেছে, মূল ছবির সঙ্গে কোনো মিল নেই। জীবনের প্রথম প্রদর্শনী নিয়ে এরকম ঘটলে যে কারো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। চিত্র প্রদর্শনীর পুস্তিকায় ছবির রংগুলো লোপাট হয়ে গেলে তার চেয়ে অর্থহীন আর কী হয়! হাবিব স্বগতোক্তির মতো বলে, এই জিনিস কারো হাতে দেওয়া যায়!

প্রথমটি শেষ হওয়ার পরপরই হাবিব আঁকতে শুরু করে পরের প্রদর্শনীর জন্যে। তার বিষয় নির্বাচনটি অভিনব ছিলো – বাংলাদেশের য়েকজন প্রধান কবির একটি করে কবিতাকে ছবিতে তুলে আনা। পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন ও বইয়ের প্রচ্ছদ করে হাবিব খ্যাতিমান হয়েছিলো, কিন্তু এগুলিকে শিল্পবোদ্ধারা সচরাচর কমার্শিয়াল বা অনুল্লেখ্য কাজ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। হাবিবের চেষ্টা ছিলো, ইলাস্ট্রেশনকে শিল্পের স্তরে তুলে আনা। এই কাজগুলি তার সেই চেষ্টার ফসল, তার নিজস্ব প্রতিবাদ। প্রায় তিন বছর ধরে ছবিগুলো এঁকেছিলো সে। ছবির গুণাগুণ বিচারের সাধ্য আমার ছিলো না, কিন্তু রাতের পর রাত তার সৎ ও সযত্ন পরিশ্রমের সাক্ষী আমি।

৬.

হাবিব চলে গেলো, সেই শীতকালেই আকস্মিকভাবে কাজী টুলুর সঙ্গে দেখা। টুলু হাবিবের ছোটো ভাই, আমেরিকাবাসী সে আমারও আগে থেকে। হাবিবের শেষ দিনগুলোর একটি ভিডিও কেউ করেছিলো, সেটি দেখায় টুলু। চমকে উঠি, এই হাবিবকে আমি চিনি না! শীর্ণকায় সে বরাবর, কিন্তু সুস্বাস্থ্যের দ্যুতি ছিলো তার শরীরে। ভিডিওতে কঙ্কালপ্রায় হাড়সর্বস্ব একটি মানুষকে দেখি, মাথাভরা কোঁকড়া চুল ঝরে গিয়ে যা অবশিষ্ট আছে তা হয়তো আঙুলে গোনা যায়। মায়াবী চোখগুলি ক্লান্ত, অবসাদমাখা। নিজের কথাগুলো আপনমনে বলে যায় হাবিব। বললো নিজের জীবনদর্শনের কথা, বোধ ও শিল্পবিশ্বাসের কথা। অনুমান করা চলে, সব কথা নিশ্চয়ই বলা তার হয়নি। যা হয়নি তা আর কোনোদিন বলা হবে না, আমাদের অজানা থেকে যাবে।

কবি রফিক আজাদ আমাকে একদিন বলেছিলেন, হাবিবের অসাধারণ মানসিক শক্তিকে অভিবাদন করতে হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেশিরভাগ মানুষই কিছু কাতর হয়, সারাজীবনের বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে হলেও হয়তো কিঞ্চিৎ ধর্মমুখী হয়ে পড়ে। হাবিব আপস করেনি, মৃত্যুকে একটুও ভয় পায়নি। পরাজয় স্বীকারের কোনো চিহ্ন তার মধ্যে ছিলো না। নিজের বিশ্বাসের ভিতটি অনেক বেশি শক্ত ছিলো, শেকড় ছিলো অনেক গভীরে। সাহসী বীরের মতো মাথা উঁচু করে চলে গেছে সে!

৭.

হাবিব, আপনাকে নিয়ে গুছিয়ে কিছু লেখা আসলে অসম্ভব আমার পক্ষে। কতো যে টুকরো কথা, টুকরো ছবি মনে আসে! কোনটা ছাড়ি, কোনটা লিখি!

অনন্ত তখন বছর পাঁচেকের। এক সন্ধ্যায় সে আপনার কোলে বসে বলেছিলো, ক্যাডবেরি কাকু (ওর জন্মদিনে কী দেবো ভেবে না পেয়ে এক বাক্স ক্যাডবেরি কিনে দেওয়ার সুবাদে আমার ওই নামকরণ হয়েছিলো), আমার বাবা সবার চেয়ে বড়ো! অনন্তর কথায় আপনি হেসেছিলেন, তাতে তৃপ্তি ও অহংকার ছিলো। আমি বলেছিলাম, ছেলে যদি পঁচিশ বছর বয়সেও এই কথা বলে তাহলেই আপনি জিতে গেলেন। হায়, অনন্তর পঁচিশ বছর হওয়া পর্যন্ত তো আপনি অপেক্ষা করলেন না!

দেশান্তরী হবো, গোছগাছের সময় আপনার দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পুস্তিকার একটি কপি সঙ্গে নিয়েছিলাম। কেন তার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। সেটি এখনো আমার পড়ার টেবিলে আছে। প্রকাশ্যে নয়, যদি নষ্ট হয়ে যায়! কিন্তু বই ও কাগজপত্রের মধ্যেই আছে, আমি চোখ বন্ধ করে হাত বাড়ালেও ঠিক পেয়ে যাবো। তার সঙ্গে আছে বিচিত্রা থেকে কেটে রাখা শাহরিয়ার কবিরের লেখা ‘কাজী হাসান হাবিবের ইচ্ছামৃত্যু’ শিরোনামের লেখাটি। আছে একটি কার্ড। আপনার অসুস্থতার খবর জেনে কিনেছিলাম। পাঠানো হয়নি, সেজন্যে কোনো দুঃখবোধ নেই কিন্তু। কার্ড পৌঁছাতে যা সময় লাগতো তার আগেই আপনার ঠিকানা বদলের সময় হয়ে গিয়েছিলো, সে ঠিকানা ডাক বিভাগের অধিগম্য নয়। আপনাকে খুব মনে পড়লে এগুলো বের করে দেখি। অসংখ্যবার পড়া, তবু শাহরিয়ার কবিরের লেখাটি পড়তে গেলে আজও চোখ ভিজে যায়।

এখন সিরাজ-মিলন-সারোয়ারের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। অনুপস্থিত হাবিবের কথা উঠলে অজান্তে কখনো চুপ হয়ে যাই আমরা। এই তো সেদিনও সারোয়ারের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম, আপনার কথা বলতে গিয়ে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলো পিতৃহীন শিশুর মতো। এই পনেরো বছর পরেও! আপনি জিতে গেছেন, আপনার জন্যে ঈর্ষা তাই খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া!

আমার আমেরিকাযাত্রার দিন এয়ারপোর্টে এসেছিলেন আপনি। বললেন, যাচ্ছেন কিন্তু ফিরে আসার জন্যে। কথা দিয়েছিলাম, ফিরবো। সতেরো বছর হয়ে গেছে, আমার কি ফেরার সময় হলো, হাবিব? আপনাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা আর কেউ জানে না। আপনিও আর মনে করিয়ে দেবেন না। ফিরবো তবে কার কাছে? কাকে বলবো, কথা রেখেছি?

ডিসেম্বর ২০০৩

email: mz1971@gmail.com